খুলনা জনপদ একটি শিল্পসমৃদ্ধ জনপদ হিসেবেই পরিচিত। বাংলাদেশের প্রাচীন নদী বন্দরগুলোর মধ্যে খুলনা অন্যতম। শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান হওয়ায় এ নগরীকে 'শিল্পনগরী' বলা হয়। খুলনা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, সাতক্ষীরা এই দশটি জেলা নিয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত।

গাজীর পট, বাউল গান, গাজীকালু চম্পাবতীর পালা, এখানকার অন্যতম লোকসাংস্কৃতিক উপাদান। রাজশাহী থেকে খুলনা বিভাগে আসার পথে তারা ট্রেনে বাউল সাধক লালনের গান শুনতে পায়—

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি

মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।

সমীরের দিদি এবং দাদা বাবু পঞ্চরত্নকে স্টেশন থেকে বাসায় নিয়ে এলো। বাসায় ঢুকে দেয়ালে ঝুলানো একটা ছবি দেখে পঞ্চরত্নের চোখ তাতে আটকে গেল। অবনী বলল আরে এমন একটি ছবির আদলে আমাদের সপ্তম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের প্রচ্ছদ করা হয়েছে। বাকিরা দেখে বলল, ঠিকতো। এবার সমীরের দিদি বললেন এই ছবিটাকে কি ছবি বলে তোমরা কি জান? আকাশ বলল গাজীর পট। দিদি বললেন ঠিক তাই গাজীর পট; আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী লোক চিত্রকলার ধারা।

অবনী জানতে চাইল এই ছবিটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? দিদি বললেন আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের গ্রামে কয়েকটি পটুয়া পরিবার থাকে। তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তোমরা কি জান পটুয়া কাদের বলে? যারা পট আঁকেন তাদের বলে পটুয়া।

আকাশ বলল শুনেছি এসব শিল্পী নাকি প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ যেমন—ফুল, লতা, পাতা, মাটি, ছাই প্রভৃতি দিয়ে রং তৈরি করে ছবি আঁকেন? দিদি বললেন তুমি ঠিক জেনেছ। তবে বর্তমান সময়ে এসে বাজার থেকে তৈরি রং কিনেও কোনো কোনো পটুয়া ছবি এঁকে থাকেন। ইরা বলল আমরা সপ্তম শ্রেণিতে প্রাকৃতিক বর্ণচক্র তৈরির করার সময় নিজেদের মতোকরে কিছুটা রং তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম। এবার যদি পটুয়া শিল্পীদের কাছ থেকে প্রাকৃতিক উপকরণে রং তৈরির পদ্ধতিটা শিখতে পারি তাহলে খুব ভাল হয়। আগুন বলল আমাদের এলাকায় রং পাওয়া না গেলেও আমরা সহজে নিজেদের মতো করে প্রাকৃতিক উপকরণে রং তৈরির করে ছবি আঁকতে পারব।

দিদি বললেন এই বিষয়ে তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি আজকেই শিল্পীর সাথে যোগাযোগ করে তোমাদের জন্য প্রাকৃতিক রং তৈরি এবং পটচিত্র আঁকার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করব। সবাই খুব খুশি হয়ে দিদিকে ধন্যবাদ জানাল। সেদিনের মতো তারা সবাই বসে খুলনা ঘোরার একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। পঞ্চরত্নের পরিকল্পনার এক ফাঁকে দিদি তাদের জানালেন—আমি পটশিল্পী নারায়ণ পটুয়ার সাথে কথা বলেছি। আমরা আগামীকাল সকালে পটশিল্পীদের গ্রামে যাব।

পরের দিন সকালে দিদির সাথে পঞ্চরত্ন পটশিল্পীদের গ্রামে পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে তারা দেখা করল গ্রামের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী কানাইলাল চিত্রকরের সাথে শিল্পীকে সহযোগিতা করার জন্য । সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পীর নাতি তরুণ পটচিত্র শিল্পী নিমাইলাল চিত্রকর। তিনি বাংলাদেশের লোকচিত্রকলার এই ধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন। পঞ্চরত্ন সেসব তথ্যের ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে রাখল। সাথে সাথে বন্ধুখাতায় লিখে রাখল। পটচিত্র সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বললেন—

পটচিত্র

পটে আঁকা ছবিকে পটচিত্র বলে। পট মানে পট্ট বা এক খণ্ড কাপড়ের টুকরা। সাধারণত এক খণ্ড কাপড়ে পটচিত্র আঁকা হয়। বাংলার লোকচিত্রকলার অন্যতম নিদর্শন হলো এই পটচিত্র। যারা পট আঁকেন তাদের বলা হয় পটুয়া। আর যারা পট প্রর্দশন করেন তাদের বলা হয় পটকুশীলব বা গায়েন। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা প্রাচীনকাল থেকে পট আঁকার সাথে জড়িত। এই আঞ্চলের পটচিত্রের ইতিহাস প্রায়

আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন। পট প্রধানত দু প্রকার । দীর্ঘ জড়ানো পট (scroll painting) ও ক্ষুদ্রাকার চৌকা পট। জড়ানো পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা ও ২-৩ ফুট চওড়া হয়। আর চৌকা পট হয় ছোট আকারের।

কালিঘাটের পট (চৌক পট)

গাজীর পট (জড়ানো পট)

একসময় গ্রাম বাংলার মানুষের বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল এটি। বাংলাদেশের রাজশাহী, খুলনা, যশোর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, কোলকাতাসহ নানা অঞ্চলে পটচিত্রের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এসব অঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে পটচিত্র ছিল বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম।

প্রথমদিকে পৌরাণিক ও ধর্মীয় ও হিতোপদেশমূলক বিষয় ছিল এসব পটের অন্যতম বিষয়বস্তু। পরবর্তীকালে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসচেতনতামূলক বিষয়বস্তু পটচিত্রে আঁকা হয়। এসব পৌরাণিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মনসাপট, রামায়ণপট, দুর্গাপট, কৃষ্ণপট, রাজা হরিশ্চন্দ্র, সাবিত্রী-সত্যবান, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, আনন্দমঙ্গাল ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রের মধ্যে কালীঘাটের পট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীঘাটের পট মূলত চৌকাপট। যা তুলনামূলক ছোট মাপের কাগজের উপর আঁকা। ঔপনিবেশিক সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে ব্যঙ্গ করে উপস্থাপন করার বিশেষ দিক কালীঘাটের পটে দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া জনসচেতনতামূলক বিষয় যেমন—পরিবেশ বিপর্যয়, বৃক্ষরোপণ, নারী ও শিশু অধিকার, যুদ্ধের খারাপ দিকসহ নানা রকম সমসাময়িক বিষয় নিয়েও পটচিত্র আঁকা হয়।

গাজীর পট

'আশা হাতে তাজ মাথে সোনার খড়ম পায়
আল্লা আল্লা বলে গাজী ফকির হইয়া যায়।
সুন্দরবন যাইয়া গাজী খুলিলেন কালাম
যত আছে বনের বাঘ জানায় ছালাম।।'

গাজীর মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরার জন্য এই স্তবক বয়ান করা হয়। গাজীর বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর পোশাক, মাথায় তাজ, পায়ে সোনার খড়মের বর্ণনা করা হয়। সৃষ্টিকর্তার প্রতি গাজীর আনুগত্য ও ভালোবাসার কথাও বর্ণনা করা হয় এই অংশে। এভাবে নান্দনিকভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয় এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প গাজীর পটের।

শত শত বছর ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে গাজীর ক্ষমতার কথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। জঙ্গলে লোক নির্ভয়ে চলাফেরা করত গাজীর নাম স্মরণ করে। কারণ এই অঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করে গাজীর নামে বনের বাঘও নত হয়। বাঘ-কুমিরের ভয় হতে গাজীর নামে মানুষ রক্ষা পেতেন। সুন্দরবন অঞ্চলে কাঠুরিয়া, বাওয়ালি এবং মৌয়ালিদের পীর হলেন গাজী পীর।

বাংলাদেশের লোকচিত্রকলার মধ্যে গাজীর পট অন্যতম। আগেকার দিনে গ্রামে-গঞ্জে বাড়ির উঠানে বিনোদনের জন্য গাজীর পট প্রদর্শন করা হতো। পট প্রদর্শনের সময় শিল্পীরা ঢোল, জুড়ি বাজিয়ে গান গেয়ে পট প্রদর্শন করত। প্রদর্শন শেষে দর্শকরা চালসহ বিভিন্ন সামগ্রী বা অর্থ শিল্পীদের উপহার হিসেবে দিতেন। শিল্পীরা পটে আঁকা ছবিকে একটা লাঠির সাহায্যে নির্দেশনা দিত। সাথে সাথে সুর তাল ও কথার সমন্বয়ে গান রচনা করে তার বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করত। গাজীর পটের বর্ণনাংশে তিনটি বিষয়ের উপস্থাপনা বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ক. গাজী পীরের মাহাত্ম্য ও অলৌকিক ক্ষমতা খ. কৌতুক মিশ্রিত হিতোপদেশ এবং গ. মৃত্যু তথা যমরাজের ভয়।

গাজীর পটের চিত্রপটটি আঁকার আগে কয়েকটি প্যানেলে ভাগ করে নেওয়া হয়। পটের মাঝের প্যানেলে আঁকা হয় গাজী পীরকে। মানিক পীর ও কালু পীরকে আঁকা হয় গাজী পীরের দুই পাশে। নাকাড়া বাদনরত ছাওয়াল ফকিরকে আঁকা হয় উপর থেকে দ্বিতীয় সারিতে। কেরামতি শিমুল গাছটা আঁকা হয় তৃতীয় সারির মাঝের প্যানেলে। তাছাড়া বাঘ, শিমুল গাছ, তসবি, হুক্কা, শিকারকৃত হরিণ ইত্যাদি বিষয়বস্তু রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। পট আঁকার ধরন বাস্তবতার সাথে মিল না রেখে বিশেষভাবে আঁকা হয়। তাছাড়া পটচিত্রে রঙের ব্যবহার করা হয় সমতলভাবে। প্রতিটি প্যানেলের ফ্রেমের চারপাশে সাদা রঙের উপর কালো অথবা খয়েরি রঙের শিকলের মতো নকশা করা থাকে।

গাজীর পট তৈরির পদ্ধতি

গাজীর পট মূলত জড়ানো। নির্দিষ্ট মাপের মোটা কাপড়ের উপর এই পট আঁকা হয়। প্রথমে তেঁতুল বিচিকে আগুনে হালকা ভেজে নিয়ে পানিতে ঘণ্টা খানেক ভিজিয়ে রাখলে খুব সহজে তার খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। খোসা ছাড়ানোর পর তা শুকিয়ে পাটায় পিষে গুঁড়া করে নিতে হয়। এরপর পানির সাথে মিশিয়ে আগুনে জ্বাল

দিয়ে আঠা তৈরি করা হয়। তেঁতুল বিচির আঠা অথবা বেলের আঠার সাথে চক পাউডার ও ইটের গুঁড়া মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে কাপড়ের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো পটুয়া কাপড়ের উপর গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে একটি জমিন তৈরি করেন। কাপড়ের উপর প্রলেপ দেয়ার পর তা ভালভাবে রোদে শুকিয়ে প্যানেলগুলো ভাগ করে নিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হয়।

পটচিত্র আঁকতে নানা ধরনের উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি নানা রকমের রং ব্যবহার করা হয়। যেমন— শিমের পাতা থেকে সবুজ, কালকেশি থেকে গাঢ় সবুজ, কাঁচা হলুদ থেকে হলুদ রং, শঙ্খগুঁড়া থেকে সাদা, সিঁদুর থেকে লাল, খড়িমাটি থেকে মেটে হলুদ, নীল গাছ থেকে নীল রং তৈরি করা হয়। ছাগল বা ভেড়ার লোম থেকে তুলি তৈরি করে পটচিত্র আঁকা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাসায়নিক রং বাজারে কিনতে পাওয়া যায় যা দিয়ে শিল্পীরা পটচিত্র আঁকেন।

গাজীর পট প্রদর্শন ও পরিবেশন

এরপর দিদি পঞ্চরত্নকে বাংলার পটচিত্র সম্পর্কে আরও কিছু নতুন তথ্য দিতে গিয়ে বলেন—

ভারতীয় আধুনিক চিত্রশিল্পের অন্যতম শিল্পী যামিনী রায় তাঁর শিল্পকর্মে পটচিত্রের আঙ্গিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রশিল্পের পথিকৃত শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর শিল্পকর্মে পটশিল্পীদের অঙ্কন শৈলিকে নিজের শিল্পকর্মে নান্দনিকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজের নামের সাথে পটুয়া শব্দটি ব্যবহার করতেন। এই শিল্পীদের প্রচেষ্টায় আধুনিক শিল্পজগতে পটশিল্প এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

সময়ের সাথে সাথে বর্তমানে মানুষের বিনোদনের মাধ্যমের পরিবর্তন হয়েছে, ফলে লোকচিত্রকলার এই ধারা প্রায় বিলুপ্তির পথে। বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত বাংলা একাডেমি এবং নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আশুতোষ মিউজিয়াম ও গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় বেশকিছু গাজীর পট সংগৃহীত আছে।

নবীন এবং প্রবীণ পটচিত্র শিল্পীদের সাথে সাথে দিদির কাছ থেকে পটচিত্র সম্পর্কে এই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে অনেক খুশি হলো সবাই। এবার পঞ্চরত্ন বিনয়ের সাথে শিল্পী কানাইলাল চিত্রকরের কাছ থেকে রং তৈরি করার প্রক্রিয়াটি শিখতে চাইল। তাদের অনুরোধে শিল্পী শেখানোর প্রক্রিয়াটি শুরু করলেন।

পাতা, ফুলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে রং তৈরির পদ্ধতি

- বিভিন্ন রকমের পাতা, ফুল সংগ্রহ করে তা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।
- তারপর পাতা অথবা ফুলগুলো ছোট ছোট টুকরো করে তা শিল-নোড়া অথবা পরিষ্কার পাথর দিয়ে ভালো করে পিষে নিতে হবে।
- এবার পিষানো পাতা বা ফুলগুলো পরিষ্কার সুতি কাপড়ে নিয়ে চাপ দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।
- ছাঁকা পাতা বা ফুলের রসে বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠা মিশিয়ে রঙ তৈরি করে ছোট কৌটায় রেখে তা ব্যবহার করা যায়।
- কালো রং তৈরির জন্য প্রথমে একটা চেরাগ অথবা কুপি জ্বালিয়ে নিতে হবে। এবার ছোট স্টিলের একটা বাটি অথবা প্লেট সে চেরাগ অথবা কুপির উপর ধরলে তাতে কুপির আগুন থেকে বের হওয়া কালি / কার্বন গুলো আটকে যাবে। পরে বাটি/ প্লেটের গায়ে আটকে যাওয়া সে কার্বনগুলো সংগ্রহ করে তা বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে কালো রং তৈরি করা যায়।
- পানের সাথে খাওয়া খয়ের থেকে খয়েরি রং, খড়ি মাটি থেকে মেটে হলুদ, কাপড়ের নীল থেকে নীল রং তৈরি করা যায়।

- ফুল ও পাতা থেকে রং বানানোর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমরা যে রঙের ফুল ও পাতা সংগ্রহ করব তা থেকে কাছাকাছি রং পাব। তৈরির প্রথম দিকে রংগুলো কিছুটা হালকা থাকে। সেক্ষেত্রে রংগুলোকে একটু আগুনে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিলে ব্যবহার করতে সহজ হয় এবং তার স্থায়িত্ব বাড়ে। এই ক্ষেত্রে বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠা পাওয়া না গেলেও খুব সমস্যা হয় না। এই ধরনের রং পরিবেশবান্ধব যা আমাদের শরীরের কোনো ক্ষতি করে না।

শিল্পী কানাইলাল চিত্রকরের কাছে পঞ্চরত্ন সারাদিন পট আঁকা এবং রঙ তৈরি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখল। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। সারাদিন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করে শেষ বিকেলের সূর্যের আলোকে সাথি করে পঞ্চরত্ন দিদির সাথে ফিরে চলল ঘরের দিকে। দেশের ঐতিহ্যময় লোকচিত্রকলার সমস্ত শিল্পীর প্রতি সম্মান আর ভালবাসা জানিয়ে এই শিল্পের গৌরবগাঁথা সাথে নিয়ে তারা চলল নতুন কিছু করার প্রত্যয়ে।

বাউল গান

পরের দিন পঞ্চরত্ন গেল কুষ্টিয়া লালন শাহ্ এর মাজারে। লালন শাহ্ এর মাজারের এলাকায় প্রবেশ করতে করতে প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল কয়েকজন বাউল হাতে একতারা, মন্দিরা নিয়ে লালনের গান পরিবেশন করে চলেছে। গান গাওয়ার সময় তারা বিশেষ ভঙ্গিতে নৃত্যও করছে।

লালনের আখড়াবাড়ি এলাকায় থাকা একটি বাউলের ভাস্কর্যকে দেখিয়ে সমীর বলল আমি জেনেছি একতারা বাউল গানের মূল বাদ্যযন্ত্র। এটি লাউয়ের খোল, চামড়া, বাঁশ ও তার দিয়ে তৈরি।

এইবার পঞ্চরত্ন দেখতে পেল লালনের মাজারের পাশেই রয়েছে লোকবাদ্যযন্ত্র বিক্রয়ের দোকান। সেখানে কারিগরেরা কিভাবে এটি বানাচ্ছে তা তারা মনোযোগের সাথে দেখে নিল। পঞ্চরত্ন একতারা সম্পর্কে জানতে

চাইলে বিক্রেতারা বলল এটিতে কেবল একটি স্বরের ব্যবহার হয়। কারণ তারটি বেশিরভাগ সময়ে গায়ক যে স্কেলে গান করে থাকে সে স্কেলের 'সা' এর সুরে বাঁধা থাকে। বিক্রেতারা পঞ্চরত্নকে একতারা বাজানোর কৌশল শিখিয়ে দিল।

এরপরে পঞ্চরত্ন সমাধিস্থলে থাকা বাউল ও দর্শনার্থীদের থেকে তারা লালন ফকির সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারলো।

লালন ফকির যে মানবতা ও সাম্যের জন্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন তা আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তিনি আজ বিশ্ব মানবতার প্রতীক। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গীতিকার ও সুরকার, সমাজ সংস্কারক, গায়ক এবং আধ্যাত্মিক সাধকগুরু। ইউনেস্কো ইতোমধ্যেই আমাদের বাউল গানকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

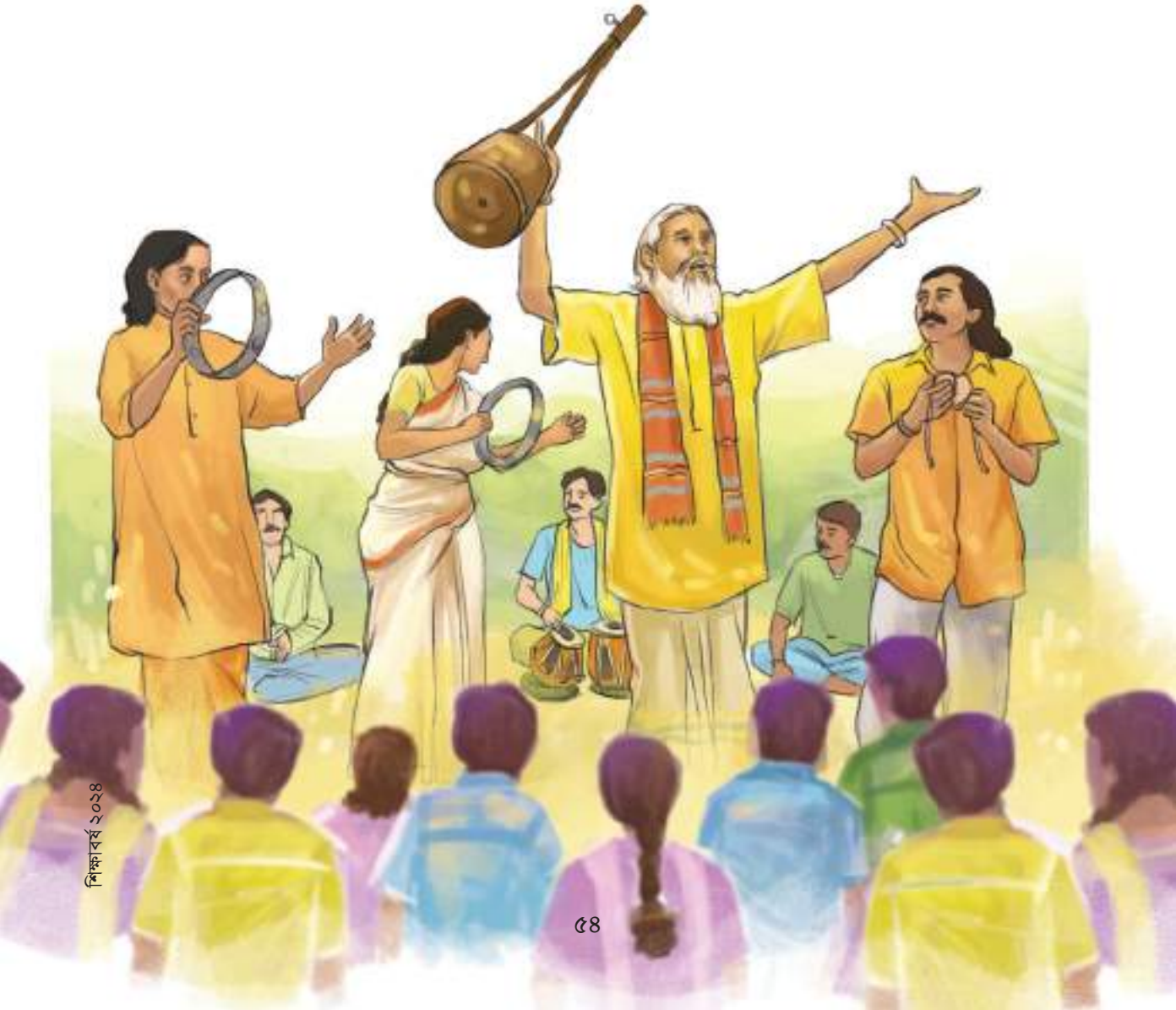

পঞ্চরত্ন দেখতে পেল লালনের আখড়াবাড়ির পাশে ঠিক সন্ধ্যার আগে একজন বাউল গাছের নিচে বসে একাকী গান করছেন। তাঁর হাতে একটি একতারা, পায়ের সাথে বাঁধা ঘুঙুর। কখনও তিনি হাতবায়া বাজিয়েও গান গাইছেন। গানের সুরের টানে আশেপাশে থাকা দর্শনার্থীরাও সেখানে গিয়ে যোগ দিল। কিছুক্ষণের জন্য পঞ্চরত্ন হারিয়ে গিয়েছিল এক অজানা সুরের ভাবনালোকে। গানের সাথে পা-মিলিয়ে বাউল তার ইচ্ছামতো নাচের ভঙ্গিও পরিবেশন করেছে, এসময়ে পঞ্চরত্ন বাউলের সাথে তাল মিলিয়ে নাচের ভঙ্গি শিখে নিয়েছে।

বাউল গেয়ে চলেছেন-

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ি
দিতাম পাখির পায়।।

আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা।
তার উপরে সদর কোঠা
আয়নামহল তায়।।

কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার।
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার
কোন বনে পালায়।।

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে।
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

বাউল সাধনার প্রাণপুরুষ দার্শনিক লালনশাহ ফকির জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার জারি, সারি, কীর্তন, পালা, গাজীরগান, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি সকল গানই তাঁকে আকর্ষণ করতো। আশেপাশের গ্রামে যেখানেই গানের আসর বসতো লালনশাহ সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। আসরে পরিবেশিত গান শুনেই সংগীতের প্রতি তাঁর ভক্তিভাব আরও বেড়ে যায়।

কৈশোরে পা রাখতেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর লালন প্রায় গৃহত্যাগী হয়ে যান। এরপর সিরাজশাহের কাছেই লালনশাহ ফকির প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাঁর গুরু, গুরু মায়ের সেবায় নিয়োজিত থেকে নিয়মিত সাধুসঙ্গ ও সেবা চালিয়ে যান।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি নিজ দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। লোকজীবনের প্রায় সকল বিষয়ই লালনের গানে আশ্রয় পেয়েছে। মারফতি, ফকিরি, মুর্শিদি, দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, মনশিক্ষা, বিচ্ছেদি, একেশ্বরবাদ, গোষ্ঠগান, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, প্রার্থনা, প্রেমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি খুব সাবলীলভাবে গানের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেছেন।

তাঁর গানের বিষয় হলো মানবপ্রেম। আধ্যাত্মিক সাধনা, দর্শনচিন্তা, মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্য তাঁর সৃষ্ট বাউল ও মরমি গান প্রতিটি বাঙালির কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি আমাদের জাতীয় ও লোকজীবনে বাউল গুরু লালনশাহ ফকির নামে পরিচিত।

বাউল গান, নাচ এবং লালন শাহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো তারা বন্ধুখাতায় লিখে নিল।

এরপর প্রথমে তারা গেল ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে। হজরত খানজাহান (রাঃ) পাঁচশ বছরের বেশি সময় আগে এই অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। স্থাপত্যশৈলিতে লাল পোড়ামাটির উপর লতাপাতার অলংকরণে মধ্যযুগীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপর তারা গেল সুন্দরবন দেখতে।

সুন্দরবন

সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা ও বরগুনা জেলার কিছু অংশ জুড়ে এই বনভূমি অবস্থিত। এই বনের সাতক্ষীরা অংশ থেকে তারা নৌযানে করে যাত্রা শুরু করল খুব সকালেই। নৌযানে থাকা ভ্রমণ সঙ্গী তাদেরকে বলল, ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে সামুদ্রিক স্রোতধারা প্রবাহিত, এরফলে কাদাযুক্ত লবণাক্ত দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে উঠেছে।

সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশ সৃষ্ট বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরী হলো এই বনের প্রধান গাছ, ধারণা করা হয় এই গাছের নাম অনুসারে এই বনের নাম হয় সুন্দরবন। এই বনে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণী রয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই বনের অন্যতম আকর্ষণ সৃষ্টিকারী প্রাণী।

নৌযানে করে নদীতে চলার সময় সেখানে বসেই তারা দুপুরের খাবার খেয়েছে। চুইঝালে রান্না করা তরকারি আর নদী থেকে ধরা বাগদা চিংড়ির রান্না করা খাবারের স্বাদ তাদের খুব ভালো লেগেছে।

এ সময় দিদিকে পঞ্চরত্ন জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা দিদি আমরা না হয় সুন্দরবন ঘুরে গেলাম এবং অনেক কিছু জানলাম, কিন্তু যে সকল বন্ধু এখানে আসতে পারেনি তারা কি করে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে?

প্রশ্ন শুনে দিদি বেশ আগ্রহের সাথেই বললেন তোমরা গাজীর পটের আদলে অথবা নিজেদের ইচ্ছামতো সুন্দরবন ও বাঘের ছবি আঁকতে পারে এবং নিজেদের এলাকায় যদি কোনো বন থাকে তা ভ্রমন করতে পার।

সুন্দরবন ভ্রমণের পর পঞ্চরত্ন এলো ঐতিহাসিক মুজিবনগরে।

মুজিবনগর

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। পঞ্চরত্ন মুজিবনগরে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এখানে স্থাপিত শিল্পকর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালীন ইতিহাসের বর্ণনা করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ, হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের নিষ্ঠুরতায় গণহত্যার ঘটনা, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ইত্যাদি ঘটনা ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমন অনেকগুলো নতুন তথ্য তারা বন্ধুখাতায় লিখে নিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বুকে ধারণ করে পঞ্চরত্ন যাত্রা করল কীর্তনখোলা নদীর তীরের জনপদ বরিশালের উদ্দেশে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে রং তৈরি করব।
- বইয়ে দেওয়া সুন্দরবনের ছবিটি পটচিত্রের মতো অথবা নিজের ইচ্ছামতো করে আঁকব। নিজেদের তৈরি রং দিয়ে অথবা পেনসিল, কলম, রংপেনসিল, প্যাস্টেল রং সহ সহজ লভ্য যেকোন রং দিয়ে ছবিটি রং করব।
- বইয়ে দেওয়া লালন শাহ এর গান ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানটি খালি গলায় অথবা ‘সা’ স্বর বাজিয়ে গাওয়ার চেষ্ট করব।
- বিষয়বস্ত দেখে পৌরাণিক পট, গাজীর পট, কালিঘাট পট ও সমসাময়িক বিষয়ের পট শনাক্ত করার চেষ্টা করব।
- আমাদের আশেপাশে কোনো পটচিত্রশিল্পী (পটুয়া) অথবা পট প্রদর্শনকারী (কুশীলব বা গায়েন) আছে কিনা তা অনুসন্ধান করব।
- লালন শাহ এর কর্ম, গান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।